কন্যাশিশু - ৪

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০০৮ উপলক্ষে বিশেষ প্রকাশনা

সম্পাদক

ড. বদিউল আলম মজুমদার

সহযোগী সম্পাদক

নাছিমা আক্তার জলি

সেপ্টেম্বর, ২০০৮

আর্থিক সহায়তায়:

অর্নব হেলথ এডুকেশন এন্ড এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ইউএসসি কানাডা, এসিড সারভাইভারস ফাইন্ডেশন, এসিটেন্স ফর স্লাম ডুয়েলার্স, চিলড্রেন এন্ড আর্থ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, তপোবন, দরিদ্র সমাজ সেবা সংঘ, চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, নারীমৈত্রী, টিএমএসএস, ডাব্লিউএসিসি, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট, পুষ্পনদী, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, রাইট্স এন্ড সাইট ফর চিলড্রেন, সেলফ স্যালভেশন বাংলাদেশ, স্টেপস্ টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ (স্যাপ),

সিসিডিবি এবং অধ্যাপক লতিফা আকন্দ।

প্রকাশনা সহযোগিতায়

পাবলিকেশন ইউনিট

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

ডকুমেন্টেশন ইউনিট

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০০৮

মূদ্রণ

ইনোসেন্ট প্রেস

১৩২, আরামবাগ, ঢাকা

ওঝইঘ ৯৮৪-৩০০-০০২৫২৮-১

প্রকাশক

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

সচিবালয়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

৩/৭, আসাদ এভিনিউ

উৎসর্গ

ইন্দ্রাণী, তিথি, তৃষা, ফাহিমা, রহিমা, রিনা, রুমি, লুনা, শাকিলা, সিমি, সোমা এবং স্বপ্নাসহ অসংখ্য কন্যাশিশুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে– যারা আমাদের সমাজ বাস্তবতায় উত্ত্যক্ততার শিকার হয়ে অকালে প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছে

সম্পাদকীয়

আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন কোটি কন্যাশিশু। সমাজে নারী-পুরুষে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সমাজে কন্যাশিশুরাই সবচেয়ে বেশী অবহেলা, বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার। তাদের প্রতি এ আচরণ দৃশ্যমান পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় পর্যায়ে। তবে গত দেড় দশকে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গৃহীত অনেকগুলো বাস্তবমুখি পদক্ষেপের কারণে কন্যাশিশুর অধিকার নিয়ে এখন একধরনের জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এ বিষয় নিয়ে আজ অনেকেই সোচ্চার। 'কন্যাশিশু এডভোকেসী ফোরামে'র সাথে জড়িত সংগঠনগুলো ও ব্যক্তিরা এ সোচ্চার জনগোষ্ঠির একটি বড় অংশ। তাদের উদ্যোগেই কন্যাশিশুদের বৈষম্যহীন, নিরাপদ বিকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে প্রতিবছর ৩০শে সেপ্টেম্বর 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস' পালিত হয়। এবারও যথাযথ মর্যাদার সাথে দিবসটি পালিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'উত্ত্যক্তকারীর শাস্তি – কন্যাশিশুর মুক্তি'।

উত্ত্যক্ততা আজ আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এটি এখন আর শুধু 'ইনোসেন্ট ফান' বা নিষ্পাপ আনন্দের পর্যায়ে নেই। এটি এখন অনেকের জন্য জোরপূর্বক বিয়ে, এলাকা বা স্কুল ত্যাগ, এমনকি আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র উত্ত্যক্ততার কারণে গত ৪ বছরে বাংলাদেশের ২৮ জন কিশোরী আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উত্ত্যক্ততা এখনও অনেকের কাছে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গন্য হয়না।

উত্ত্যক্ততা প্রতিরোধের জন্য যথাযথ আইন প্রয়োজন, যা আমাদের দেশে নেই। যে আইনগুলো বহাল আছে সেগুলোরও প্রয়োগ নেই বললেই চলে। দণ্ডবিধি আইনের ৫০৯ ধারা ও ২৯৪ ধারা এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশের ৭৫ ও ৭৬ ধারা উত্ত্যক্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু এগুলোর তেমন কোন কার্যকারিতা নেই। এছাড়া উত্ত্যক্ততার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিদ্যমান আইনকেও শিথিল করা হয়েছে। যেমন, 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০'-এ ইভটিজিং-কে যৌন হয়রানির একটি ধরন হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু অপব্যবহারের কারণে ২০০৩ সালে আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে যৌন হয়রানির শর্তগুলোকে শিথিল করা হয়েছে। ফলে এর আওতায় ইভটিজিং-এর ঘটনার আইনি প্রতিকার পাওয়া এখন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দেশে উত্ত্যক্ততার শিকার ব্যাক্তি বা পরিবার সহজে আদালতের শরনাপন্ন হতে চাননা। কারণ এক্ষেত্রে উত্ত্যক্ততার শিকার মেয়েটিকেই প্রমান করতে হবে তাকে কোন মন্তব্য, কোন অঙ্গভঙ্গি করা হয়েছিলো যা তার জন্য হয়রানীমূলক ছিলো ইত্যাদি। এভাবে আইনের আশ্রয় চাওয়াটাই অপমানজনক হওয়ায় উত্ত্যক্ততার অভিযোগে সাধারনত কোন পুলিশ কেস পাওয়া যায়না। এছাড়াও বিচার প্রক্রিযায় রয়েছে অযাচিত দীর্ঘসূত্রিতা।

নিঃসন্দেহে উত্ত্যক্ততা আজ আমাদের সমাজে একটি গুরুতর অপরাধী কর্মকান্ডে পরিণত হয়েছে, যার প্রতিকার জরুরি। আর এর প্রতিকারের জন্য সরকার, বেসরকারী সংস্থা, মিডিয়া ও সচেতন নাগরিক সমাজসহ সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকে আইনগুলোর যথাযথ সংস্কার করতে হবে, যাতে এগুলো 'ভিকটিম ফ্রেন্ডলি' হয় এবং উত্তক্ততার যারা শিকার তাদের জন্য আইনের আশ্রয় নেওয়া সহজ হয়। সর্বোপরি আইনগুলোকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

উত্ত্যক্ততা প্রতিরোধে সমাজের সর্বস্তরের সচেতন নাগরিকদের এবং সামাজিক সংগঠনগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। গড়ে তুলতে হবে একটি সামাজিক আন্দোলন। এমনি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ২০০০ সালে অনেকগুলো উন্নয়ন সংগঠন আর নাগরিকদের উদ্যোগে গঠিত হয় 'জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম'। ফোরামের উদ্যোগে 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস' পালনের সাথে সাথে সারাবছরব্যাপি দেশজুড়ে কন্যাশিশুদের নিরাপদ বিকাশের বিভিন্ন কর্মসুচি পালন করা হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগীতা, বিতর্ক, র‍্যালি, বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। একইসাথে প্রকাশ করা হলো 'কন্যাশিশু-৪' সংকলনটি।

কন্যাশিশুদের জন্য একটি সুন্দর আগামির প্রত্যাশায় যে সকল লেখক তাদের মুল্যবান নিবন্ধ দিয়ে এ সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। অভিনন্দন ফোরামের সদস্যদেরকেও, যারা সংকলনটি প্রকাশে ও প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় সহায়তা করেছেন। আগের মতো এবারও নিবন্ধনগুলোকে লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে সাজানো হলো। আশা করি পাঠকরা আমাদের সীমাবদ্ধতা ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

সফল হোক কন্যাশিশুর বৈষম্যহীন সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা!

কন্যাশিশুর অধিকার: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ

আয়শা খানম*

কন্যাশিশুও শিশু। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত জন্মের পর থেকেই তারা বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। ছেলে সন্তান জন্ম নিলে শুরু হয় ঘরে ঘরে আনন্দ, আযান, উলুধ্বনি বা বিশেষ উৎসব। আর কন্যাশিশু জন্ম নিলেই দেখা যায় পিতা-মাতা, আত্মীয়দের বেদনাগ্রস্ত চেহারা, উৎসবহীন পরিবেশ। এরপর কন্যাশিশু জীবনের প্রতিটি স্তরে মৌলিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়। এই অধিকারহীনতা, বৈষম্য, শোষণ ও নির্যাতন, আর্থ-সামাজিক বা শ্রেণীগত অবস্থানের কারণে ভিন্ন হয়। গবেষকদের মতে, বাল্যবিবাহ, ধর্ষণ, জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক তৈরি, যৌনাঙ্গ কর্তন, কন্যাশিশুর ভ্রুণ হত্যা, জোরপূর্বক দেহ ব্যবসায় বাধ্য করা, কন্যাশিশু পাচার ইত্যাদি দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার কন্যাশিশুদের প্রতি নির্যাতনের ধরন।

শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়স্করা শিশু। দেখা যায়, এই বয়সে বাংলাদেশের কন্যাশিশুদের একজন পূর্ণবয়স্ক নারীর মতোই মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাজনিত প্রায় সকল ধরনের নেতিবাচক অভিজ্ঞতার শিকাৰ হতে হয়। এসব বৈষম্য ও নির্যাতনের কারণ সাধারণত

ষ পশ্চাৎপদ পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

ষ পশ্চাৎপদ সামাজিক সংস্কৃতি

ষ শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের অনগ্রসরতা

ষ ধর্মীয় চরম গোঁড়ামী

ষ জনসাধারণের কন্যাশিশু ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতনতা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক সনদ ও বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর

কন্যাশিশুদের জন্য বিশেষভাবে ভাবার প্রসঙ্গটি আসে ১৯৯০ সালে বিশ্ব শিশু সামিটে (ডড়ৎষফ ঝঁসসরঃ ভড়ৎ ঈযরষফৎবহ ১৯৯০)। সম্মেলনে কন্যাশিশুর আইনগত অধিকারে যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে তাদের ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি ও বিকাশের যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এরপরও শিশু অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশও অনেকগুলো আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও সনদে স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত 'শিশু অধিকার সনদ'। ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সনদটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন ও গ্রহণ করে। ১৯৯০ সালের ২৬ জানুয়ারি সনদের মূল দলিলটি সদস্য রাষ্ট্রসমূহের স্বাক্ষর, অনুসমর্থন ও জাতিসংঘ নীতিমালার অন্তর্ভুক্তির জন্য উন্মুক্ত করা হয়। প্রথম দিনেই যেসব রাষ্ট্র এতে স্বাক্ষর দান করে বাংলাদেশ তাদের অন্যতম। ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট বাংলাদেশ এই সনদে অনুসমর্থন দান করে, অর্থাৎ সনদের বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। উল্লেখ্য যে, শিশু অধিকার সনদে বিস্তারিতভাবে কন্যাশিশুদের অধিকারের কথা বলা আর এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

ষ নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের গুরুত্বপূর্ণ দলিল 'সিডও সনদ'(ঈড়হাবহঃরড়হ ড়হ ঃযব ঊষরসরহধঃরড়হ ড়ভ অষষ ঋড়ৎসং ড়ভ উরংপৎরসরহধঃরড়হ অমধরহংঃ ডড়সবহ)। এই সনদের ১৬টি ধারায় নারী–পুরুষের সমতার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালের ৬ই নভেম্বর এই দলিল অনুমোদন করে এগুলো বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

ষ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে বেইজিং কর্মপরিকল্পনা। এতে নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে চিহ্নিত ১২টি বিষয়ের একটি অন্যতম ইস্যু হলো জরমযঃং ড়ভ ঃযব মরৎষ পযরষফ বা কন্যাশিশুর অধিকার। দলিলটিতে কন্যাশিশুর পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যগত অবস্থান ও তা থেকে উত্তরণের জন্য করণীয় অনেক কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা হহয়েছে। অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও এসব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

ষ জাতিসংঘের অনেকগুলো অধিবেশনে কন্যাশিশুর প্রতি অগ্রাধিকার ও নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেমন, জাতিসংঘের ৬০তম অধিবেশনে কন্যাশিশুর জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব (জবংড়ষঁঃরড়হ ৬০/১৪১ ড়হ ঃযব মরৎষ পযরষফ) গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ এসব সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সরকারের বিভিন্ন ঘোষণা, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদে স্বাক্ষর ও বহুমুখী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের দেশে কন্যাশিশুরা অনেক ধরনের বঞ্চনা ও মানবাধিকার লংঘনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যেমন:

১. শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে কন্যাশিশু ও পুত্রশিশুর মাঝে পরিবার ও সমাজের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এখনও ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।

২. যৌন হয়রানি ও নির্যাতন ও শারীরিকভাবে অন্যান্য নিগ্রহ এখনও ব্যাপক।

৩. দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে পরিবারে ও সমাজে এখনও কন্যাশিশুদের ৮/১০ বছর বয়স থেকেই সহজ বাধাহীন চলাফেরা, মেলামেশার ওপর নানা ধরনের শর্ত আরোপ হতে থাকে। কন্যাশিশুর যতই বয়স বাড়তে থাকে, প্রথা, সংস্কার, ধর্ম ও ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির নামে তাদের পায়ে বেড়ি পরানো হতে থাকে ততই।

৪. কন্যাশিশুদের অনেক পরিবারেই বোঝা হিসেবে মনে করা হয়, কারণ তাদের বিয়ে দিতে গেলে যৌতুকের জন্য পরিবারে বাড়তি অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে পুত্রসন্তান হলে অর্থ সম্পদ ঘরে আসবে। তাই ংড়হ ঢ়ৎবভবৎবহপব বা পুত্র প্রাধান্য পরিবারে এখনও বিদ্যমান।

৫. কন্যাশিশুরা ধর্ষণ, অপহরণ, দেহ ব্যবসা, বিদেশে পাচার, পরিবার ও আত্মীয় দ্বারা যৌন হয়রানি বা নিপীড়ন এবং গৃহ পরিচারিকা হিসেবে অন্য পরিবারে কাজ করতে গিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ধর্ষণের শিকার কিশোরী অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান নিয়ে সামাজিক হেয় দৃষ্টিভঙ্গি ও চরম অপমানের শিকার হয়ে মানসিকভাবে গ্লানিকর জীবন যাপন করছে।

৬. বাল্য বিবাহ ও এর ফলে কিশোরী মাতারা আর্থিক ও সামাজিকভাবে নিরাপত্তাহীন জীবনযাপন করছে।

৭. স্বাস্থ্য সুযোগ ও প্রজনন বিষয়গত জ্ঞানের অভাব, প্রজনন অধিকার ও যথাসময়ে এ বিষয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে ব্যাপক অজ্ঞতার কারণে কন্যাশিশুরা প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৮. সমাজের সামগ্রিক সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে নিরাপত্তাহীনতা, আইন পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে, যার প্রতিফলন ঘটে ইভটিজিং-এর মত সমস্যার মাধ্যমে।

সরকারি ঘোষণা ও বেসরকারি অনেক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও কন্যাশিশুদের নিগ্রহ ও বঞ্চনা কেন বন্ধ হচ্ছে না তা আজ ভাবা দরকার। গভীরভাবে ভাবা দরকার বাল্যবিবাহের বিষয়টি নিয়েও। বাল্যবিবাহের মূল কারণ সাধারণত দারিদ্র্য, অল্পবয়সী মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব ও সামগ্রিকভাবে জীবনের নিরাপত্তার সমস্যা, যৌন নির্যাতনের ভয় ইত্যাদি। এই বাল্যবিবাহ রোধে সরকারকে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়া কন্যাশিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎড়ঢ়ড়ঁঃ বা স্কুল থেকে ঝরে পড়ার বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সমস্যা। তাই শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচির সাথে সাথে অভিভাবকদের দারিদ্র্য

বিমোচন, ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন বন্ধ করার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। উপরন্তু কন্যাশিশুর শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ অগ্রগতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত শতকরা কয়জন নারী উচ্চশিক্ষায় যেতে পারছে, এই হিসাব আরও বস্তুনিষ্ঠভাবে করা দরকার।

যৌন নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ ও কন্যাশিশুদের জীবনে বিরাট সমস্যা। এ সকল সমস্যা শহর, গ্রাম, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রয়োজন। সম্প্রতি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত এবহফবৎ অহধষুংরং ড়ভ ঝঁরপরফব রহ ঈড়হঃবসঢ়ড়ৎধৎু ইধহমষধফবংয শীর্ষক গবেষণায় থেকে দেখা যায়, ৫০ জন আত্মহত্যাকারী নারীর বেশিরভাগেরই বয়স ১০-২০ বছরের মধ্যে। আর এদের অধিকাংশ আত্মহত্যা করেছে নানা প্রকার নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে, অভিমানে, ভবিষ্যৎ ব্যর্থ ও অনিশ্চিত জীবনের কথা ভেবে। পত্রিকার গত ৬ মাসের ক্লিপিং পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে প্রায় প্রতিদিন কমপক্ষে একজন কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার হয়। ধর্ষণ মানে তার সীমাহীন শারীরিক ক্ষতি এবং অনেক সময় সেই স্বাস্থ্য ও দেহগত ক্ষতি আর পূরণ করা যায় না। আর মানসিক ক্ষতি তো কোনোমতেই পূরণ হবার নয়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে ধর্ষিত কন্যাশিশুদের পরিবার সামাজিকভাবে হেয় হয়ে পড়ে। আর এর সবটুকু মনঃস্তাত্ত্বিক, সামাজিক চাপ ভয়াবহভাবে পড়ে ধর্ষিতা কন্যাশিশুর উপর। এক্ষেত্রে এসব ঘটনার জের হিসেবে ধর্ষিতা তরুণীরা আত্মহত্যা করে। আর এ ভয়াবহ চিত্রের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি বাংলাদেশের কন্যাশিশুর মানবাধিকার প্রশ্নটি কোন পর্যায়ে আছে।

কন্যাশিশুদের অবস্থা পরিবর্তন করতে হলে বাংলাদেশে উত্তরাধিকার আইন সংশোধন করা একান্ত জরুরি। কারণ এতে পিতার সম্পত্তিতে পুত্র কন্যা সম-অধিকার ভোগ করেন না। এ ধরনের সকল বঞ্চনা দূর করে কন্যাশিশুদের নিরাপদ, সমতাপূর্ণ, অধিকারসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সকল সুযোগ দিতে হবে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বেঁচে থাকার মতো মৌলিক অধিকারসহ সকল প্রকার অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা ও পরিবেশ জীবনের শুরুতেই করতে হবে। সর্বোপরি পরিবার, পিতামাতা, অভিভাবক, শিক্ষক তথা পুরো সমাজকে এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকেও শিশু অধিকার সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের সনদসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরো আন্তরিক ও উদ্যোগী হতে হবে।

আন্তর্জাতিক নীতি, সনদ, কনভেনশন, কর্মসূচি জাতীয় পর্যায়ে যথাযথভাবে দ্রুত সময়ে বাস্তবায়নের জন্য কেবলমাত্র অর্থ বা প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধাই যথেষ্ট নয়। এর জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন দেশের রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সদিচ্ছা। তা না হলে কন্যাশিশু দিবস পালন নেহায়েত আনুষ্ঠানিকতায়ই সীমাবদ্ধ থাকবে। পোশাক শিল্প থেকে শুরু করে ক্ষেতে-খামারে কর্মরত মেয়েদের থাকা, খাওয়া, বাসস্থান, যাতায়াত, চলাফেরাসহ জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তা পরিবেশ যদি আমরা গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে কন্যাশিশু তথা নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এছাড়াও অর্জিত ইতিবাচক অভিজ্ঞতার আলোকে, বিরাজমান সমস্যাগুলো দূরীকরণের পক্ষে সচেতন পদক্ষেপ নিতে হবে। তাই আমাদের সুপারিশসমূহ হলো–

ষ নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি ইতিবাচক ও সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, যার প্রভাব ও প্রতিফলন পড়বে সমাজ ও রাষ্ট্রে।

ষ শিশু সনদ (ঈজঈ) সিডও সনদ ও বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা ঘধঃরড়হধষ অপঃরড়হ চষধহ সরকারিভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ষ গউএ -তে বর্ণিত নারী শিক্ষা কর্মসূচি কীভাবে বাস্তবায়িত হবে তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের বাস্তব কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা।

ষ ওঈচউ- এর আলোকে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করা।

ষ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ’৯৭ পুনর্বহাল করা।

ষ পিতার সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার সমান অধিকার নিশ্চিত করা ও সম্পদ-সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা।

ষ শিল্প, কল-কারখানা বিশেষ করে পোশাক শিল্পে যেসব নারীরা কাজ করে তাদের বয়স অধিকাংশই ১৮-এর মধ্যে। এসব ক্ষেত্রে কর্মরত কন্যাশিশুদের অর্থনৈতিক শোষণ, স্বাস্থ্য অধিকারহীনতা ও যৌন নির্যাতন অবসানের জন্য শিল্প মালিক, সরকার, শ্রমিক সংগঠনের যৌথভাবে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

ষ কন্যা শিশুদেরকে ইভটিজিংসহ বিভিন্ন প্রকার যৌন হয়রানি থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তরুণ, কিশোর, যুব সমাজকে কন্যাশিশু ফোরাম ও বৃহত্তর পরিসরে নারী অধিকার আন্দোলনের কর্মসূচিতে যুক্ত করা।

ষ কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অভিভাবক ফোরাম গঠন করা।

ষ বিদ্যালয়ে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র ভর্তির হার বৃদ্ধির সাথে সাথে, উৎড়ঢ়ড়ঁঃ বা স্কুল থেকে ঝরে পরা যাতে বন্ধ হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া।

ষ বাল্যবিবাহের হার কমানো ও কিশোরী বয়সেই মাতৃত্বের বোঝা এবং এর থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্যগত জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি মূল্যায়ন করা।

ষ সহজ, সুলভ, গণমুখী, বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি চালু রাখা ও পাঠ্যসূচিতে যৌন শিক্ষা, এবহফবৎ ও মানবাধিকার বিষয়ক ইস্যু যুক্ত করা।

ষ প্রচলিত নারী-পুরুষের বৈষম্যপূর্ণ সংস্কৃতি পরিবর্তনে সাংস্কৃতিক কর্মকা পরিচালনা ও গণমাধ্যমে নারীর ইতিবাচক উপস্থাপন নিশ্চিত করা।

ষ কন্যাশিশুর মানবাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে প্রচলিত আইনের সংস্কার করা ও 'কন্যাশিশু বোঝা নয়, সম্পদ' এই দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

ষ প্রতিবন্ধী কন্যাশিশুদের জন্য ইবরলরহম কর্মপরিকল্পনার আলোকে (ঝঃধহফধৎফ জঁষবং ড়হ ঃযব ঊয়ঁধষরুধঃরড়হ ড়ভ ঙঢ়ঢ়ড়ৎঁঃহরঃরবং ভড়ৎ চবৎংড়হং রিঃয উরংধনরষরঃরবং) বিশেষ জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ষ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার উপযোগী সংস্কৃতি ও পরিবেশ গড়ে তোলা।

ইভটিজিং : চাই সামাজিক প্রতিরোধ

চিররঞ্জন সরকার*

প্রায়ই পত্রপত্রিকায় আমরা দেখছি যে বখাটে যুবকদের উৎপাতে মেয়েরা রাস্তাঘাটে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারছে না। আমাদের দেশে প্রতিদিন কতো মেয়ে এভাবে রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত ও হয়রানির শিকার হচ্ছে তার কোনো সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান না থাকলেও এটা বলা যায় যে, এ ধরনের ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে নারী, বিশেষ করে কন্যাশিশুদের অনেকে নিরাপত্তাহীনতার কারণে লেখাপড়া ছেড়ে ঘরবন্দি জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। অনেকের অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এই ইভ টিজিং-এর প্রকোপ বর্তমানে এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে যে খিলগাঁওয়ের সিমি, মিরপুরের ফাহিমা, খুলনার রুমি, গাইবান্ধার তৃষা, স্বপ্না, সাভারের তিথির মতো অসংখ্য কিশোরী নিজের জীবনের সমাপ্তি টেনেছে আত্মহননের মধ্য দিয়ে। উত্ত্যক্ততা ও হয়রানির ঘটনায় বাংলাদেশে যেভাবে আত্মঘাতী হওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরকম নেই। অবশ্য অন্যান্য দেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আইনি প্রতিকার পাওয়া যায়। আর আমাদের দেশে আইনি প্রতিকার তো দূরের কথা, এরকম ঘটনায় পরিবার ও সমাজের মানসিক সমর্থনও অনেক সময় পাওয়া যায় না। গাইবান্ধার শিশু তৃষা কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের ছাত্রী সিমি আত্মহননের পথ বেছে নেয়ার পর দেশব্যাপী অনেক হৈচৈ হয়েছে। নারী আন্দোলনের কর্মীরা বিষয়টি নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামও গড়ে তুলেছিল। কিন্তু এ পর্যন্তই। ইভটিজিং তাতে কমেনি।

ইভটিজিং কেন হচ্ছে

যৌন হেনস্থা পাশ্চাত্য দেশগুলির থেকে ভারতবর্ষে বিশেষত আমাদের এই বাংলাদেশে অনেক বেশি ঘটে। যদিও এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েরা পুলিশের কাছে গিয়ে যৌন হেনস্থার কথা রিপোর্ট করেন না। মারাত্মকভাবে আহত না হলে, পুলিশ এ ব্যাপারে শুধু ডায়েরি নেয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছু করে না বলে বহু অভিযোগ শোনা যায়। এফআইআর নেওয়ার ব্যাপারে পুলিশের যে অনীহা আছে, তা পত্র পত্রিকায় ও নানা রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে। বরং পুলিশ এ ব্যাপারে নারীাদের আইনের সাহায্য না নিতেই উপদেশ দিয়ে থাকে।

নারীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই মূলত উত্ত্যক্ততা ও হয়রানির সূত্রপাত ঘটে। পুরুষতান্ত্রিক মন-মানসিকতায় পুষ্ট সমাজ ভাবে নারীরা সব সময় পুরুষের অধস্তন, তাই তাদের সঙ্গে ইচ্ছামতো ব্যবহার করা যায়। তাদেরকে শুধু ভোগ্য বা পণ্য হিসেবে দেখার প্রবণতা বাড়ছে। বিশেষ করে গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপন, মিউজিক ভিডিও, সিনেমা ইত্যাদিতে নারীর উপস্থিতি এখন অনেকটাই যৌন বস্তু (ংবী ড়নলবপঃ) হিসেবে। নাটক-সিনেমা-উপন্যাসে ইভটিজিং-এর মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার প্রেমের সূত্রপাত দেখতে দেখতে উঠতি তরুণরা নিজেরাও উক্ত্যত্ততাকে গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়। বিবিধ কারণে আজ যুবসমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ও ঘটছে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন বা লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে। ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, রাজনৈতিক প্রভাব, সামাজিক অস্থিরতা প্রভৃতিও এই অপরাধের পেছনে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

উত্ত্যক্ত ও হয়রানির পথ ধরে অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, জোরপূর্বক বিয়ে, আত্মহত্যা, পরিবারের এলাকা ত্যাগ, মা-বাবা-ভাইয়ের হতাহত হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে থাকে। এর নেতিবাচক প্রভাবও ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজসহ বিভিন্ন পর্যায়েই পড়ে। কিন্তু আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কখনো কখনো

একে একটি রোমান্টিক ইমেজ দিতে চায় এবং টিজিংকারী পুরুষদের 'রোমিও' বলে অভিহিত করা হয়। রোমান্টিকতার আড়ালে ইভটিজিং-এর কুফল বা নেতিবাচক পরিণতিগুলো তাই আমাদের চোখে পড়ে না।

কেন আমাদের দেশে যৌন হেনস্থা এত বেশি, এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া উচিত। গবেষকের মতে, এ ব্যাপারে স্যাটেলাইট চ্যানেল, টিভি নাটক, বিজ্ঞাপন এবং হিন্দি সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ প্রভার রয়েছে। এছাড়া এর জন্য সমাজে বিদ্যমান নারী পুরুষ বৈষম্য এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অভাব দায়ী। কিছু গবেষক অবশ্য বিশ্বাস করেন, যেসব মেয়েরা অন্তঃপুর থেকে বাইরের জগতে পড়াশুনা বা কাজ করতে বের হচ্ছেন তাদের অবদমন করাই এ ধরনের যৌন হেনস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইভ টিজিংয়ের বিভিন্ন ধরন বা রূপ

ইভটিজিং আগে কেবলমাত্র কথা বা শিস দিয়ে মেয়েদের উত্যক্ত করার মধ্যে থাকলেও, বর্তমানে ইভটিজিংয়ের ধরনও বদলাচ্ছে এবং এতে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। এখন গ্রামে-গঞ্জে মেয়েরা নিরাপদে স্কুল কলেজে যেতে পারে না। অভিভাবকরা আতংকে থাকেন। স্কুল বা কলেজের যাত্রাপথে বখাটেরা রাস্তার ধারে দলবেঁধে থাকে এবং মেয়েদের যাত্রাপথে অশ্লীল মন্তব্য, বাজে অঙ্গভঙ্গি করে থাকে এবং উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভয়-ভীতি দেখায়। এছাড়া বখাটেরা অজ্ঞাত পরিচয়ে মোবাইল ফোনে উত্ত্যক্ত করে। এছাড়া এরা মোবাইল ফোনের নম্বর সংগ্রহ করে হুমকির পাশাপাশি অশ্লীল ম্যাসেজ পাঠায়।

আগে পাড়া বা মহল্লার ছেলেরাও নিজ পাড়ার মেয়েদের অন্য পাড়ার ছেলেরা এসে টিজ করলে তাকে তারা রক্ষা করতো। ফলে ঐ পাড়ায় মেয়েরা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারতো। এখন মানুষের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কে ভাটা পড়ায় কেউ আর সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে না, পাছে উল্টো ফল হয় এই ভেবে।

কেউ কেউ উঠতি বয়সী তরুণ বা আরো একটু বয়সীদের এরূপ আচরণকে 'তারুণ্যের উচ্ছ্বাস' বলেন। কিন্তু কোনো চল্লিশোর্ধ্ব ভদ্রলোকের এরূপ আচরণকে কিসের উচ্ছ্বাস বলবেন? আমরা কি ধরে নিতে পারি না যে, এরূপ সকল আচরণই অযাচিত? মেয়েদের প্রতি এমন আচরণ যারা করে তাদের সামগ্রিক গতিবিধিই স্পষ্ট করে দেয়, যে তারা কোনো সৎ উদ্দেশ্য থেকে এটা করছে না। অনেক বয়স্ক লোক আছেন যারা কোনো জনবহুল জায়গাতে (হাসপাতাল, বাসস্ট্যান্ড, রেলস্টেশন) মেয়েদের দেখলে অযাচিতভাবে আলাপ জমিয়ে দেন। এই মুখোশধারীরা অভিভাবকত্বের অধিকার দেখিয়ে মেয়েদের হয়রানি করে। এরকম আরও অনেক পন্থা প্রয়োগ করে উত্ত্যক্ত করা হয় মেয়েদেরকে।

ইভটিজিং না যৌন হেনস্থা?

টিজিং এর আভিধানিক অর্থ পরিহাস, জ্বালাতন ইত্যাদি। তাই ইভটিজিং শুনলে মনে হয়, সেটা দুষ্টুমি হতে পারে কিন্তু সে রকম অন্যায় নয়। পাশ্চাত্য দেশে অবশ্য এই শব্দটা ব্যবহার করা হয় না। এই আচরণ যৌন হেনস্থার (ংবীঁধষ যধৎধংংসবহঃ) আওতায় পড়ে।

অনেকের মতে, ইভটিজিং শুধু অশ্লীল কথা বা অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে মেয়েদের বিরক্ত করা, অন্যপক্ষে যৌন হেনস্থার সাথে দৈহিক জোরজবর দস্তি ও শ্লীলতাহানি যুক্ত থাকে। এইভাবে দুটির পার্থক্য করা দুরূহ। আবার কেউ কেউ যৌন হয়রানি ও ইভটিজিং এর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখেন না। শুধু 'ইভ টিজিং' কথাটা ব্যবহার করেন যখন যৌন হেনস্থা রাস্তায় ঘটে কিংবা যেখানে জনগণের চলাচল আছে, যেমন বাস, পার্ক বা সিনেমা হলে। আর 'যৌন হেনস্থা' শব্দটা ব্যবহার করেন যখন ঘটনাটি ঘটছে অফিসে বা চার দেয়ালের অন্তরালে।

ইভ টিজিং : দায়ী আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

আসলে ইভটিজিংয়ের শিকড় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধের মধ্যেই মিশে রয়েছে। নারীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ও সহিংস সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক, সহমর্মিতাপূর্ণ, দায়িত্বশীল, সুস্থ সম্পর্কের বিকাশের প্রতি মনোযোগ দেয়া দরকার। এ ব্যাপারে পরিবার থেকেই উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে, পরিবর্তন করতে হবে নেতিবাচক মানসিকতা। শিশুর বেড়ে ওঠা ও সামাজিকীকরণের মধ্যেই নারীর প্রতি এই বিদ্বেষ ও সহিংস মনোভাব আত্মস্থ হয়ে পড়ে এবং তা ছেলে শিশুর ব্যক্তিত্বের অংশে পরিণত হয়। পরিণত জীবনে যাকে মুছে ফেলা কঠিন হয়। তাদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে যাতে তারা মেয়েদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদার মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে। ক্ষমতাবান পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নির্মিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এই আচরণকে গুরুত্বের

সঙ্গে দেখা হয় না। কখনো তা তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, কখনো বা দুরভিসন্ধিমূলক হতে পারে। এই বিরক্তিকর আচরণ সম্পর্কে মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমাজ মূল্যায়ন করে না। বরং উল্টোভাবে দেখবে। মেয়েটাই অনেকটা এ ব্যাপারে প্রলুব্ধ করেছে।

ইভটিজিং-এর মতো মেয়েদের প্রাণসংহারক একটি গুরুতর অপরাধকে হাল্কাভাবে দেখার এবং এর দোষ মেয়েদের ঘাঁড়ে চাপানোর প্রবণতাই এর ব্যাপ্তি বাড়াতে সহায়তা করছে। আমাদের রক্ষণশীল সমাজের ধারণা, মেয়েদের জায়গা ঘরে আর ছেলেদের জায়গা ঘরের বাইরে। পরোক্ষভাবে তারা ইভটিজিং এর জন্য মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদের অশালীনতাকেই দায়ী করে। এমনও বলা হয়ে থাকে যে মেয়েরা 'অশালীন পোশাক' পরে রাস্তাঘাটে চলাচল করে বলেই হয়রানির ঘটনা ঘটে। হয়রানিকারীদের দায়ী না করে সমাজ উল্টো মেয়েদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাদেরকে মানসিকভাবে আরো বিপর্যস্ত করে তোলে। অন্যদিকে অপরাধীরা দ্বিগুণ উৎসাহে এ কাজ চালিয়ে যায়। সমাজের চাপ এবং নিরুৎসাহতার কারণে এ ব্যাপারে আইনের দ্বারস্থ হতেও সমস্যা হয়।

আইনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই

আমাদের দেশে ইভটিজিংয়ের ঘটনা থেকে আত্মহত্যার ঘটনা আশংকাজনক হারে বাড়ছে। দেশের প্রচলিত যেসব আইনে ইভটিজিং জাতীয় কর্মকাণ্ডের বিচার সম্ভব সেগুলো হলো: দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (ধারা ২৯৪ এবং ৫০৯), ঢাকা মহানগরী পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (ধারা ৭৬)। দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারায় বলা হয়েছে, 'যদি কেউ কোনো নারীর শালীনতার অমর্যাদা করার জন্য কোনো মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গি বা কোনো বস্তু প্রদর্শন করে তাহলে ওই ব্যক্তি এক বছর কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। দণ্ডবিধি আইনের ২৯৪ ধারায় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্যদের বিরক্তি সৃষ্টি করে কোনো প্রকাশ্য স্থানে কোনো অশ্লীল কাজ করে বা কোনো প্রকাশ্য স্থানে বা তন্নিকটে কোনো অশ্লীল গান, গাঁথা বা পদাবলী গায়, আবৃত্তি বা উচ্চারণ করে তাহলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত কাজকে অপরাধ হিসেবে ধরা হবে এবং উক্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৩ মাস পর্যন্ত মেয়াদের কারাদ সঙ্গে জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারে। অন্যদিকে মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রচলিত পুলিশ অধ্যাদেশের ৭৬ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কেউ কোন রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বা সেখান হতে দৃষ্টিগোচরে স্বেচ্ছায় এবং অশালীনভাবে নিজ দেহ এমনভাবে প্রদর্শন করে যা কোনো গৃহ বা দালানের ভিতর থেকে হোক বা না হোক, কোনো মহিলা দেখতে পায় বা স্বেচ্ছায় কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে কোনো মহিলাকে পীড়ন করে বা তার পথরোধ করে, বা কোনো রাস্তায় বা সাধারণের ব্যবহার্য স্থানে অশালীন ভাষা ব্যবহার করে, বা অশ্লীল আওয়াজ, অঙ্গভঙ্গি বা মন্তব্য করে কোনো মহিলাকে অপমান বা বিরক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দণ্ড বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।

এছাড়া একই অধ্যাদেশের ৭৫ ধারায় সর্বসমাজে অশালীন বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণের শাস্তি হিসেবে তিন মাস মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ডের বা পাঁচশত টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু এসব অপরাধের সাক্ষ্য প্রমাণের দায়িত্ব নিতে হয় অভিযোগকারীকেই, যা একটি দুরূহ বিষয়। তাই আইনগুলো মেয়েদের উত্ত্যক্ততা প্রতিরোধে কার্যকরী নয়। এগুলোতে নারীদের উত্ত্যক্ত করার জন্য শাস্তির বিধান আছে সর্বোচ্চ মাত্র তিন মাস বা এক বছর কারাদণ্ড কিংবা দু'হাজার টাকা জরিমানা। জরিমানা আদায় না হলে কী করা হবে তার উল্লেখ নেই কোথাও। এই ন্যূনতম শাস্তির বিধান দিয়ে এ ধরনের অপরাধের প্রতিকার কতোটা সম্ভব তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তাছাড়া এই আইনগুলোর কথা সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, খোদ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বা আইনজীবীরাও অনেকে জানেন না।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এ ইভটিজিং-কে যৌন হয়রানির একটি ধরন হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যদিও 'ইভটিজিং' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু ২০০৩ সালে আইনটি সংশোধনের মাধ্যমে যৌন হয়রানির শর্তগুলোকে শিথিল করা হয়েছে। ফলে এর আওতায় ইভটিজিং-এর ঘটনার আইনি প্রতিকার পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০০৩ সালের সংশোধনীতে একটি নতুন উপধারা সংযুক্ত করা হয়, যাতে কোনো নারী সম্ভ্রমহানির কারণে আত্মহত্যা করলে আত্মহত্যার প্ররোচনার দায়ে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। তবে এখানে সম্ভ্রমহানির কোনো সংজ্ঞা বা আওতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি। এ আইনে বলা হয়েছে, যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারী বা শিশুর শরীর স্পর্শ করলে বা শ্লীলতাহানি করলে শাস্তির বিধান হচ্ছে সর্বোচ্চ ১০ বছরের ও সর্বনিম্ন ৩ বছরের কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড। তবে স্পর্শের প্রসঙ্গ থাকায় তা হয়রানি বা আত্মহত্যায় প্ররোচনার ভেতরে পড়ে না। ফলে এর আওতায় ইভটিজিং-এর কারণে আত্মহত্যার শিকার মেয়েরা যে এ আইন হতে প্রতিকার পাবে না তা আর বলার দাবি রাখে না।

তাই প্রয়োজন ইভটিজিং সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট ও কঠোর আইন। যখন প্রতি বছরই আত্মসম্মান রক্ষায় বা বিচারহীনতায় নির্যাতিতরা আত্মহত্যায় বাধ্য হচ্ছে তখনো কেন আইনের ব্যাখ্যার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে? আমাদের দেশে এত বাঘা বাঘা আইনবিদ থাকতেও আজো একটি অপরাধের যথাযথ ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়নি?

ইভটিজিংয়ের ফলে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা

জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী নারীর ওপর যে কোনো ধরনের দৈহিক, জেবিক ও মানসিক ক্ষতিসাধন করা বা করার চেষ্টা করা নারী নির্যাতনের অন্তর্ভুক্ত। যা থেকে স্পষ্ট যে নারী নির্যাতন কেবল দৈহিক নির্যাতনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইভটিজিং বর্তমানে নারী নির্যাতনের একটি নতুন হাতিয়ার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। একসময় সমাজের বখে যাওয়া একটি ক্ষুদ্র অংশই ইভ টিজিং-এর সাথে জড়িত থাকলেও এখন উঠতি বয়সী তরুণ, কিশোর, যুবকরা তো আছেই; মধ্য বয়সীরাও এত অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে যে ধরনের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয় সেটিও অনভিপ্রেত। ভয়-ভীতি পার হয়ে যখন নির্যাতিতা মেয়েটি পরিবারে সদস্যদের কাছে ঘটনাটি খুলে বলে তখন পরিবারের মূল্যবোধের কথা চিন্তা করে মেয়েটির জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে বিয়ের মাধ্যমে তাকে ঠেলে দেয়া হয় ভিন্ন এক জগতে।

আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক মেয়েশিশু ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হলেও এসএসসি পরীক্ষায় আগেই ঝরে পড়ে। স্কুল থেকে মেয়েশিশু শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার অন্যতম একটি কারণ হলো বাল্যবিবাহ। অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়েছে শিক্ষার আলো থেকে ইভটিজিংয়ের ফলে। সচ্ছল পরিবারের অভিভাবকরা সন্তানদের পড়াশুনার বিষয়টির কথা চিন্তা করে শহরে পাঠিয়ে দেয়। প্রথম আলোর ২০০৬ সালের ২১ এপ্রিলের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে বাজিতপুরে এসএসসি পাশ করার পর ৪০-৫০ জন শিক্ষার্থীর উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা ভৈরবের ছাত্রীনিবাসে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জীবনের আশা- আকাঙ্ক্ষার যবনিকা টানতে হয়। অথচ এই জঘন্য অপরাধের জন্য তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না। অনুসন্ধানে আরও দেখা গেছে উত্ত্যক্ততাকারী এসব বখাটে ছেলেরা বেশিরভাগই সচ্ছল পরিবারের সন্তান। সমাজে তাদের ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত থাকে। ফলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায় না। যদি কোনো অভিযোগ করা হয় তাহলে ভিকটিম পরিবারকেই তার খেসারত দিতে হয়।

ইভ টিজিং মানবতাবিরোধী জঘন্য অপরাধ

ইভটিজিংয়ের মাধ্যমে বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ বিকৃত বিনোদন খোঁজে। এর ফলে নির্যাতিতা কিশোরী বা তরুণীটি কী ধরনের মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে সময় অতিবাহিত করে তা ওই পরিবারের সদস্যরাও অনেক সময় বোঝে না। পরিণতি হিসাবে যা ঘটে তা খুবই অনভিপ্রেত, অনাকাঙ্ক্ষিত।

আমাদের সংস্কৃতিতে নারীর সম্ভ্রম বিবেচনা করা হয় সতীত্বের দিক বিচার করে। অথচ একজন নারী সমাজের কিছু বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ দ্বারা সম্ভ্রম হারালে তখন মেয়েটিকেই অসতী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। যে মেয়েটি তার সম্ভ্রমের কথা চিন্তা করে আত্মহননের পথ বেছে নেয় তার পেছনেও এই সম্ভ্রমবোধ কাজ করে বলে সম্ভ্রমহীন অর্থহীন জীবনের চেয়ে সে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে। প্রশ্ন হলো, আমাদের সমাজের মেয়েরা কি এভাবে বলী হয়েই চলবেন? আর আমরা একটু আহা-উহুর মধ্য দিয়েই আমাদের যাবতীয় দায়িত্ব শেষ করবো? সভ্যতার বড়াই করবো?

চাই সামাজিক প্রতিরোধ

ইভটিজিংয়ের ফলে আমাদের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অপরিমেয় ক্ষতি হচ্ছে। ইভটিজিং-এর কারণে মেয়েরা স্বাভাবিক সব সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়ে প্রথাগত গৃহবধূর ভূমিকায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ফলে সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সব মিলিয়ে আপাতদৃষ্টিতে কম ক্ষতিকর মনে হওয়া এই ঘটনাটির জন্য জাতিকে অনেক বড় মূল্য দিতে হয়। তাই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে। মেয়ের পাশাপাশি একটি ছেলের মানসিক দিকটিও ভাবতে হবে। মেয়েদের বলা হয় সবকিছু মুখ বুজে সহ্য কর। এই সংস্কৃতি আমাদের ত্যাগ করতে হবে। সকল সংগঠন, কর্মক্ষেত্রগুলোর ভিতর এসব নিয়ে আলোচনা করতে হবে। যেহেতু এটা একটা সামাজিক সমস্যা তাই এতে সকলকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবারকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এ অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে হবে। ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নারীকে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আমাদের অবশ্যই নীরবতা ভেঙে রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত ও হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে মেয়েশিশুর জীবন বিকাশের জন্য একটি বৈষম্য-নির্যাতনমুক্ত সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না।

একটি মুখের হাসির জন্য

জুবাইদা গুলশান আরা*

শিশুকে আমরা জানি আমাদের সবচেয়ে আনন্দের ধন হিসেবে। আমাদের আশা, স্বপ্ন সব কিছুকে ঘিরে আমাদের শিশুরা বেড়ে ওঠে। কিন্তু এই কঠিন পৃথিবী এখনও শিশুদের বিপদহীন সুখকর জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। তবে আশার কথা এই যে, সারা বিশ্বই আজ শিশুকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। শিশুর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানসিক বিকাশকে ঘিরেও ভাবনা চিন্তা এবং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ তথা ঈজঈ এর প্রথম বিশ্ব কংগ্রেসের (১৯৯৬) 'দি স্টকহোম ডিক্লারেশন এ্যান্ড এজেন্ডা ফর এ্যাকশন' বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সঙ্গে যুক্ত আরও একাধিক সনদ রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের শিশুদের প্রতি যৌন নিপীড়ন, যৌন শোষণ এবং শিশু পাচারের মতো বিষয়গুলি নিয়ে সরকার এবং বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে এসব বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিক একটি রিপোর্ট তৈরি হয়। পরবর্তীতে কর্মপন্থা নির্ধারণ, বিশেষ করে কন্যা শিশুদের জন্য সহায়ক সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই রিপোর্ট বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এই কথাগুলো লিখতে বসেও গভীর বেদনাদায়ক কিছু নির্মম সত্য তুলে ধরা প্রয়োজন। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ঘটনা আমাকে তীব্রভাবে আঘাত করে। ফলের ঝুড়িতে নিহত নারীদেহ অথবা ঝিলের পানিতে বস্তাবন্দি ধর্ষিতার লাশ এখন প্রায় নিত্যকার ব্যাপার। যে শহরে আমরা বাস করি, সে শহর এখন বলা যায় নীরব মৃত্যু আর হত্যার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এখন স্বামীরা রীতিমতো আয়োজন করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্ত্রী হত্যার ঘটনা ঘটান। কিন্তু এত কিছুর পরেও একটি নয় বছরের নিষ্পাপ কিশোরীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পড়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। উদ্ধারকারীরা সন্দেহ করেছেন, ঐ শিশুটি হয়তোবা ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। এটা খুব নতুন বিষয় নয়। শিশুদের যোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার জন্যে পৃথিবীর মানবাধিকার চেতনা যতই উচ্চকিত হোক, এ রকম মর্মন্তুদ ঘটনা কিন্তু প্রায়ই ঘটছে। এবং ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে মানবাধিকার।

শিশুর অধিকার রক্ষা করা আমাদের সবার জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘদিনের প্রয়াস, কল্যাণকামী সমাজ সচেতনতা নিয়ে গড়ে উঠেছে কন্যাশিশু দিবস। প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বর আমরা কন্যাশিশু দিবস উদযাপন করি। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত কন্যাশিশুর জন্য গ্রহণ করা হয় নানা কার্যক্রম। কন্যাশিশুদের অবস্থান নানাভাবে বিন্যস্ত করে দেখলে দেখা যাবে, দক্ষিণ এশীয় দেশগুলিতে শিশু নিপীড়ন নানাভাবে সক্রিয়। পরিবারের ভেতরে এবং বাইরে, সমাজে শ্রমদানে, যৌন নিপীড়নে, বাল্য বিবাহে, নানাভাবেই শিশুরা নিগৃহীত হয়। অর্থনৈতিক কারণে বাবা মা শিশু কিশোরদের ফুল বিক্রি করতে, বাসা বাড়ির কাজে পাঠায়। ছেলেদের হোটেলে বা মোটর মেরামতীর কাজে লাগিয়ে দেয়। এভাবে বিরাট একটা অংশের শ্রমে যুক্ত হয়ে পড়ে শিশুরা। নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশ, নেপাল থেকে প্রচুর মেয়ে শিশু পাচার হয়ে ভারত–পাকিস্তানে চালান হয় এবং এসব পাচার হওয়া শিশুরা বাধ্য হয় মানবেতর জীবন যাপনে। অথবা হারিয়ে যায় চিরকালের মতো।

এছাড়া দেশের মধ্যেও ইট ভাঙা, কারখানায় কাজ করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে শিশুরা। এদের মধ্যে আবার কন্যা শিশুরা রেহাই পাচ্ছে না রাস্তা ঘাটে বখাটেদের হাতে উত্ত্যক্ত হওয়ার হাত থেকে। রেহাই পাচ্ছে না যৌন নিপীড়নের হাত থেকে। এসব জানা সত্ত্বেও তার প্রতিকার যেন অনেকটাই কঠিন। বরং অল্প বয়সের মেয়ে শিশুকে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য দ্রুতই বিয়ে দিয়ে দেন পিতা মাতারা। শুধু তাই নয়, পাচার হয়ে যাওয়া মেয়ে শিশুকে ফিরে পেয়ে আইনি সহায়তার অভাবে বিপন্ন বোধ করেন অভিভাবক। পুলিশি হেফাজতে বয়স্ক অপরাধীর সঙ্গে হাজতে থাকাকালীন শিশু কিশোরদের অনেক অমানবিক আচরণের শিকার হতে হয়।

বলা বাহুল্য, মেয়ে শিশুর জীবন স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক। বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি: ২০০৭ আইএলও কনভেনশন নং ১৮২, জাতীয় শ্রমিক জরিপ ২০০২-২০০৩, বি.বি.এস, শিশু গৃহপরিবার ভিত্তিরেখা জরিপ ২০০৬, আইএলও, অনুচ্ছেদ ৪, আইএলও সনদ ১৮২ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী ৪ কোটি ২৪ লাখ শিশু রয়েছে। এর মধ্যে ৭৪ লাখ শিশু আয়মূলক কাজের সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে ৬৪ লাখ শিশু গ্রামাঞ্চলে এবং ১৫ লাখ শিশু শহরাঞ্চলে বসবাস করে। এদের যে শ্রম দান তার অনেকটাই জনসাধারণের কাছে মূল্যায়িত হয় না। শ্রমের প্রকৃত অথবা পেশা হিসেবেও ধরা হয় না। কিন্তু এসব শিশুর রয়েছে জ্ঞানার্জন ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা, বিনোদনে অংশগ্রহণ বা সাংস্কৃতিক গুণাবলি।

এ বিষয়গুলো বিগত দশকের মাঝামাঝি থেকে নানাভাবে সমাজকর্মীদের গোচরে আসে। সুখের বিষয় এই যে, কর্মজীবী শিশু কিশোর কেন্দ্র ইউসেপ, সেভ দ্য চিল্ড্রেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, ইউনিসেফ, হার্ড টু রিচ শিক্ষা কেন্দ্র, আইএলও, মহিলা আইনজীবী সমিতি, আইন সাহায্য পরামর্শ কেন্দ্র প্রভৃতি বেসরকারি সংস্থা এসব অন্যায় প্রতিকারে এগিয়ে আসে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। পরিবারে আশ্রয়হীন ভবঘুরে শিশুদের জন্য এবং অভিভাবকহীন শিশুদের জন্য সেভ দি চিলড্রেন গড়ে তুলেছে দিনের আশ্রয় কেন্দ্র বা ওয়ান স্টপ শেল্টার।

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে কন্যা শিশুদের মূল্যায়নে। এছাড়া দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বিপুল সংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী ও কর্মীকে উজ্জীবক হিসেবে গড়ে তুলে গ্রাম পর্যায়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইউনিসেফ বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সঙ্গে যুক্তভাবে শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, টিকাদান কর্মসূচি এবং আর্লি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করে চলেছে।

বাংলাদেশ সরকার শিশু কিশোরদের জন্য কিশোর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান' ইত্যাদি কার্যক্রম যুক্ত করেছে কন্যা শিশু বিষয়ে নতুন মাত্রা।

নানা বিষয়ে দক্ষতাও রয়েছে শিশুদের। এদিকে লক্ষ রেখে অনেক প্রতিষ্ঠান এখন কাজ করছে। এক্ষেত্রে কর্মজীবী শিশু কল্যাণ কেন্দ্র বা ইউসেপ স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নানা প্রক্রিয়ায় কাজ করে আসছে। বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও সিটি কর্পোরেশন, ক্যানাডিয়ান ও সুইডিশ সিডা এবং ইউনিসেফের ১৯টি জাতীয় কমিটি একসঙ্গে কয়েকটি বিষয় নিশ্চিত করে কাজ করে চলেছে। তার মধ্যে রয়েছে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী শহরের এক লাখ ২০ হাজার কর্মজীবী মেয়ে এবং ৮০ হাজার কর্মজীবী ছেলেকে প্রচলিত শিক্ষা গ্রেড তিন ও পাঁচ সমমানের ৪০ মাসের মৌলিক শিক্ষা প্রদান। বারো হাজার মেয়ে ও আট হাজার ছেলেকে জীবিকা অর্জনের কাজে প্রশিক্ষণের সুযোগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া। এছাড়া এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শিশুশ্রম নীতিমালা শক্তিশালী করা, শিক্ষকদের মধ্যে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং এসব বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে একটি করে মনিটরিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা।

(উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা, খাদ্য, পুষ্টি বিষয়ে শিশু কল্যাণ ফেডারেশন, প্ল্যান–বাংলাদেশ ও ইউনিসেফের সহযোগিতায় ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এর ফলে শিশু বিশেষ করে কন্যা শিশুদের বিষয়ে বহু অজানা তথ্য সমাজের গোচরে এসেছে। পূর্বের অনেক ঘাটতি পূরণ করা পরিবার অবকাঠামোর পুনর্মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়েছে। নির্যাতিত মেয়ে শিশুদের সেবা প্রদান ও পর্যবেক্ষণের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে একটি ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। মহিলা আইনজীবী সমিতি নির্যাতিত বা অপহৃত শিশু, বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের পুনর্বাসন ও আইনগত সহায়তা দিচ্ছে।

এ পৃথিবীতে নারী আন্দোলনের বিশাল ধারা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের রয়েছে জাতীয় শিশুবিষয়ক নীতি। এসবই আশা ও আনন্দের কথা। এ বিষয়ে "অসহবংঃু ওহঃবৎহধঃরড়হধষ বলে– ঝড়ঁঃয অংরধ্বং পযরষফৎবহ ৎবঢ়ৎবংবহঃ ড়হব য়ঁধৎঃবৎ ড়ভ ঃযব ড়িৎষফ্হং পযরষফৎবহ- যিধঃ যধঢ়ঢ়বহং ঃড় ঃযবস রং রসঢ়ড়ৎঃধহঃ ভড়ৎ পযরষফৎবহ মষড়নধষষুচ এই কথা মাথায় রেখেই আমরা দেখছি–অষষ ঃযব মড়াবৎহসবহঃং ড়ভ ংড়ঁঃয অংরধ যধাব সধফব ধ পড়সসরঃসবহঃ ঃড় ঁঢ়যড়ষফ ঃযব ঁহরঃবফ হধঃরড়হং পড়হাবহঃরড়হ ড়হ ঃযব ৎরমযঃং ড়ভ ঃযব পযরষফ (ঈজঈ) ধহফ যধাব ংঃৎবহমঃযবহবফ ঃযবরৎ পড়সসরঃসবহঃ ঃযৎড়ঁময ঃযব ঝড়ঁঃয অংরধহ অংংড়পরধঃরড়হ ভড়ৎ জবমরড়হধষ ঈড়ঢ়ঢ়বৎধঃরড়হ (ঝঅঅজঈ). এঃযব ঝঅঅজঈ পড়ঁহঃৎরবং ংরমহবফ ঃড়ি রসঢ়ড়ৎঃধহঃ পড়হাবহঃরড়হং ড়হ পড়সনধঃরহম রহ ঃৎধভভরপশরহম ড়িসবহ ধহফ পযরষফৎবহ ধহফ ঃৎবধঃ ঃযরং ধং পৎরসরহধষ ড়ভভবহংব ড়ভ ধ ংবৎরড়ঁং হধঁৎব.চ[কধঃযসধহফঁ .১১ ঔধহঁহধণু ২০০২] সার্ক দেশসমূহের এ দৃঢ় সিদ্ধান্তকে পৃথিবীর সব দেশ সম্মান জানায়।

এখন সময় এসেছে আমাদের নিজেদের চিন্তা চেতনাকে শিশু জগতের উপযুক্ত করে তোলার। লক্ষ করা যায়, ২০০৭ সালের জাতীয় বাজেটে শিশু পরিবার, সেবা হোম, প্রতিবন্ধী শিশু সহায়তার জন্য সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী অধিকার বিষয়ক সনদে স্বাক্ষর করেছে। শিশুদেরকে মলিনতামুক্ত সুস্থ জীবনের অধিকার দিতে হবে। এ বিশ্বকে শিশুদের বাসযোগ্য করে তুলতে হবে–এই হলো সকল জাতির সম্মিলিত অঙ্গীকার। সে অঙ্গীকার রক্ষা করা সহজ নয়। এও একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি। সারা বিশ্ব যত উন্নত হয়েছে ততই বেড়েছে তার জটিলতা।

যুদ্ধে, দারিদ্র্যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, জীবাণু সংক্রমণে, মারণাস্ত্রের ভয়াবহ প্রতিযোগিতার মাঝখানে শিশুরা বড় অসহায়। অতর্কিত আক্রমণে মুছে যায় তার শৈশব, স্বপ্ন, স্নেহভরা আশ্রয়। তারই সুরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে হবে শিশুর জন্য কল্যাণ চিন্তা। প্রচার মাধ্যম ও প্রচারণা, গ্রামীণ সমাজের অজ্ঞ জনপদে পৌঁছাতে হবে জ্ঞানের আলো। এ কথা সত্যি যে আমাদের অর্জন নিতান্ত নগণ্য নয়, তবু নির্মম সত্য এই যে, সমাজ কখনও কখনও সঙ্কীর্ণ ধর্মান্ধতায় এবং নিষ্ঠুরতায় ভয়াবহ হয়ে ওঠে। অনেক স্নেহে, অনেক মমতায় যে শিশু ঘরে আসে, তার প্রতি আপনজনেরাই হয়ে ওঠে উদাসীন, কখনও বা নির্মম। প্রয়োজনে তাকে দিয়ে পশুর আচরণ করিয়ে নেয়। কন্যা শিশুর অধিকার অর্থ শুধু মায়ের নয়, গোটা সমাজের পুরো মানবাধিকারের বিষয়। এ সত্য অনুভবের জন্য সজাগ কর্মপদ্ধতির পথ ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। এতে পদে পদে বাধা আসে অনভিজ্ঞতার কারণে। মানুষকে সচেতন করে তোলার কঠিন কাজটি সম্পন্ন করে তবেই শিশু অধিকারের প্রতি নিবিষ্ট হওয়া সম্ভব। মনে রাখা প্রয়োজন, আজকের শিশুরাই আগামীর ভবিষ্যত।

শেষ করবার আগে একটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। আমার গাড়ির জানালার কাছে এসে হাত পেতে ছিলো ছোট্ট হাসিখুশী একটি বালিকা। কোলে ঝুলছে তার শিশু ভাইটি। বললাম, 'তুই এই বাচ্চা নিয়ে রাস্তায় কেন? ও বললো, আমার মা তিন বাসায় কাজ করে। তাই আমাকে ঘরের কাজ, কোলের ভাইয়ের দেখাশোনা–সব করতে হয়।' 'স্কুলে যাস না? জানতে চাই আমি। 'হ্যাঁ'– ঘাড় হেলিয়ে হাসি মুখে জবাব দেয়। বিনা বেতনের প্রাথমিক স্কুলে সে পড়ছে। তবে এখন আর যাওয়া সম্ভব হয় না। আমি জিজ্ঞেস করতেই সে গড় গড় করে ইংরেজি বাংলায় সংখ্যা, অক্ষর চমৎকার নির্ভুল বলে যায়। আমি একেবারে মুগ্ধ। কিছু টাকা এতক্ষণে ওর হাতে দেই আমি। বলি, 'তুই এত ভালো পড়া বলেছিস, তার পুরস্কার। মাকে বলিস অন্তত সপ্তাহে দুটো দিন যেন তোকে পড়তে যেতে দেয়। এখন দৌড়ে গিয়ে কিছু খেয়ে নে।' একটু পরে সে খাবার কিনে তৃপ্তি করে খায়, তার মুখে খুশির হাসি।

সত্যিই শিশুটি ক্ষুধার্ত ছিলো। ছোট্ট ভাইটাকে যত্নে কোলে ধরে রাখে সে। আমার বুকের ভেতরটা ব্যথা করে ওঠে। না, কোনো সমানাধিকারের স্লোগান আমার মনে জাগে না। আমি শুধু ভাবি, কত স্বল্পে শিশুটির মুখে হাসি ফোটানো যায়। কতটুকুই বা ওর দাবি? একটু চেষ্টা করলেই তো আমরা গড়ে তুলতে পারি সুন্দর এক শিশুজগৎ। এজন্যই বলতে চাই, একটি শিশুর মুখের হাসির জন্য অনেক দূর যাওয়া যায়। আজ এই হাসিটুকু থেকে মানব সমাজকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই।

আদিবাসী সমাজে নারী ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

তপতী সাহা*

এবার ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'নারী ও কন্যাশিশুর উন্নয়নে বিনিয়োগ'। নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এ যাবৎ বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল প্রতিপাদ্যটি নারীর প্রতি ন্যায়সম্মত (বয়ঁরঃধনষব) দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন।

নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাম্য (বয়ঁরঃ) দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ পদক্ষেপ (ংঢ়বপরধষ সবধংঁৎব) মানে বাড়তি সুবিধা নয়। সুবিধাবঞ্চিত, অনগ্রসর গোষ্ঠীকে এগিয়ে নেয়ার জন্য রাষ্ট্র যখন বিশেষ মনোযোগ দিয়ে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে সেটাই সাম্য দৃষ্টিভঙ্গি (বয়ঁরঃ ধঢ়ঢ়ৎড়ধপয)। এই এ্যাপ্রোচ যখন নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাকে বলা হয় জেন্ডার সাম্য (মবহফবৎ বয়ঁরঃ)। জেন্ডার সাম্য ও সমতা নিয়ে আলোচনা করা আমার আজকের লেখার মূল উদ্দেশ্য নয়। "নারী ও কন্যাশিশুর উন্নয়নে বিনিয়োগ" এই স্লোগানের মাধ্যমে যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সেটি হচ্ছে নারী ও কন্যাশিশুর উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া, বিশেষ বরাদ্দ দেয়া। তবে এই বিশেষ পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা হতে হবে বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা ও গোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুসারে। কারণ শ্রেণী, অঞ্চল ও গোষ্ঠীভেদে নারী ও শিশুর প্রয়োজন এক রকম নয়।

বাংলাদেশের আদিবাসী গোষ্ঠীর নারী ও কন্যাশিশু আমার আজকের লেখার মূল প্রতিপাদ্য। আদিবাসী গোষ্ঠীর নারীদের বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান, তাদের বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি এসব কিছুই বিবেচনা করতে হবে আদিবাসী গোষ্ঠীর উন্নয়ন পরিকল্পনার সময়। তার আগে আমরা দেখি আদিবাসী সমাজে নারীদের অবস্থা ও অবস্থান কেমন?

আদিবাসী সমাজে নারী

বাংলাদেশে মোট প্রায় ৪৫টি আদিবাসী গোষ্ঠীর বসবাস। যাদের বেশির ভাগই বাস করে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, রাজশাহী, সিলেট, পটুয়াখালী ও বরগুনার বিভিন্ন অঞ্চলে। চাকমা, গারো, মনিপুরি, মারমা, সাঁওতাল, ওরাও, খাসিয়া, ত্রিপুরা, মুরং, হাজং এবং রাখাইন সম্প্রদায়ই প্রধানত বাংলাদেশের পরিচিত আদিবাসী জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে বর্তমানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১২,০৫,৯৭৮। এর মধ্যে নারী ৫,৮৯,১০০ ও পুরুষ ৬,১৬,৮৭৮ (চড়ঢ়ঁষধঃরড়হ ঈবহংঁং ২০০১, ইইঝ ২০০৬)।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে দারিদ্র্য ও কিছু প্রভাবশালী বাঙালি জনগোষ্ঠীর শোষণ-লুণ্ঠন। আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বদ্ধমূল ধারণা প্রচলিত রয়েছে। বিশেষত আদিবাসী নারীদের সম্পর্কে মনে করা হয় যে তারা তাদের সমাজে পুরুষের চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতায়িত। কেননা আদিবাসী নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন এবং কোনো কোনো আদিবাসী সমাজে মাতৃসূত্রীয় পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। যদিও সকল আদিবাসী সমাজে মাতৃসূত্রীয় পদ্ধতি প্রচলিত নেই। তাছাড়া সম্পত্তির অধিকার থাকলেই যে নারী সকল ক্ষেত্রে অধিকার লাভ করে এটাও ঠিক নয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, আদিবাসী নারী বাঙালি নারীদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনতা ও সম্মান পেয়ে থাকে। আদিবাসী সমাজে নারী একজন মানুষ, সমাজে আছে তার স্বাধীনতা ও অধিকার। এ সমাজে নারী কাজ করে ঘরে-বাইরে, ক্ষেতে-খামারে। এভাবে চলে

আসছে আদিকাল থেকে বংশ পরম্পরায়। সত্যিকার অর্থে আদিবাসী সমাজে নারীদের এই সম্মানজনক অবস্থানের কথা শুনলে অবাক হওয়ার কথা। এখন আমরা কয়েকটি আদিবাসী গোষ্ঠীর সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করবো

সাঁওতাল:

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, পিতা সম্পত্তির মালিক ও পরিবার প্রধান। পিতার পরিচয়ে সন্তানেরা পরিচিত। পিতার মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তি ছেলের নামে লিখে দেন। ইচ্ছা করলে কিছু অংশ স্ত্রীর নামে দিতে পারেন। বিয়ে করলে ছেলেরা পৃথক পরিবার গড়ে তোলে। বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণ পোষণের দায়িত্ব কেউই নিতে চায় না। এদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথার প্রচলন আছে। একজন ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করতে পারে। আবার ইচ্ছা মতো ত্যাগও করতে পারে। বিবাহ সংক্রান্ত তেমন কোনো বাধা ধরা নিয়ম নাই। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার সময় সামান্য কিছু টাকা পয়সা দিতে হয়।

ম্রো:

ম্রো সমাজে অনেকগুলো গোত্র আছে। একই গোত্রের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিবাহ হয় না। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। সন্তানেরা পিতার বংশ পরিচয়ে পরিচিত। ম্রো সমাজে সম্পূর্ণ নারী স্বাধীনতা রয়েছে। নারীর আলাদা পুরুষতান্ত্রিক বৈষম্য নেই। কাজের কিছু ভাগ আছে, তা উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। এই সমাজে নারী পুরুষের মতোই স্বাধীনভাবে পাহাড়ে-অরণ্যে জুমের কাজ করতে যায় ও বাজার করে, ঘর গৃহস্থালী দেখে ও সন্তান লালন পালন করে। একজন পুরুষও এ কাজগুলিই করে থাকে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যা থেকে সহজেই নারী পুরুষের সমান অধিকারের প্রমাণ মেলে। বিয়ে অনুষ্ঠান যেভাবেই হোক না কেন, কনেকে পণের টাকা দিতেই হবে এবং অস্ত্রশস্ত্রও দিতে হবে। বরপক্ষ ধনী অথবা দরিদ্র যাই হোক না কেন।

রাখাইন:

পিতা মূলত পরিবার প্রধান। সেই হিসেবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ বলা যেতে পারে। পিতার অবর্তমানে মাতা প্রধান। উল্লেখ্য যে পুত্র ও কন্যা সমানভাবে সম্পত্তির অধিকারী হয়। যদি স্ত্রী মারা যায় তাহলে স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে স্বামী। অনুরূপ স্বামী মারা গেলে স্ত্রী সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। সম্পত্তির ভাগাভাগির ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে সবাই সমান। এই অর্থে মাতৃ বা পিতৃতান্ত্রিক কোনোটাই বলা যায় না। নারী পুরুষ উভয়ই কাজ করে। কৃষিকাজই রাখাইনদের মূল পেশা। তাঁতের কাজ আদি ও বংশগত পেশা হিসাবে বিবেচিত। অতীতে অবশ্য মহিলারা তুলা থেকে সুতা তৈরির কাজও করতেন। রাখাইনদের আরেকটি অন্যতম পেশা হলো শুঁটকি মাছের ব্যবসা এবং বাঁশ খেকে তলই তৈরি করে। বাঁশ থেকে বেত বানিয়ে মহিলাদের নিকট দেয়, মহিলারা তা বুননের কাজ করে।

চাকমা :

চাকমারা পিতৃতান্ত্রিক বা পিতৃপ্রধান পরিবারের আদিবাসী। পিতাই হলো পরিবারের প্রধান ব্যক্তি। তারপরের স্থান হলো মায়ের। পরিবারের বড় ছেলে পিতার সূত্র ধরে বংশ গণনা করে। বংশকে গুথি বলে। গুথি অর্থাৎ গোষ্ঠী বা গোত্র শব্দের সমার্থক। এই সমাজে জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুতে গুথিগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

মায়ের দিকের নিকট আত্মীয়কে বিবাহ করতে পারবে না। কনে বিয়ের পর শ্বশুরের গ্রামে চলে যায় ও স্বামীর সাথে ঘর বাঁধে। কনের যদি কোনো ভাই না থাকে বা ভাই অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় জামাইকে তার পরিবারের সঙ্গে বাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। বিয়েতে পণ প্রথা প্রচলন আছে। তবে পণটি দেন বরপক্ষ। কোনো জামাতা যদি এককালীন পণ দিতে না পারে তবে যতদিন তা শোধ না করা হয় ততদিন কনে তার বাবার পরিবারে বাস করবে। কী পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে কনেকে ক্রয় করে তা এখানে উল্লেখ নাই। চাকমা যুবক অর্থ দিয়ে স্ত্রীকে ক্রয় করে থাকে। অন্য উপজাতির মধ্যে এই প্রথার প্রচলন নাই বললেই চলে। কনে পণ শোধ হলে বর ও কনে বরের বাবার বাড়িতে চলে যায়। এমন ক্ষেত্রে বাসভূমিকে বলা হয় মাতৃ পিতৃঅঞ্চল বা ভিটা।

গারো, হাজং ও মান্দাই:

ময়মনসিংহ জেলায় মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর উপজাতি আছে, তারা হলো- গারো, হাজং ও মান্দাই। গারোদের সমাজ মাতৃপ্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক (মাতৃতান্ত্রিক মানে মাহারিবাদ)। সন্তানেরা মায়ের উপাধি গ্রহণ করে। বিয়ের পরও কোনো স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষের কৌলিক উপাধি বদলায় না। গারো সমাজে বিয়ের পর

স্বামী স্ত্রীর বাড়িতে চলে যায় এবং স্ত্রীর পরিবারভুক্ত লোক বলে গণ্য হয়। স্বামীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্ত্রীর। পরিবারে মায়ের কর্তৃত্ব প্রধান। কন্যারা মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, সম্পত্তির উপর পুত্র বা পুরুষের কোনো প্রকার উত্তরাধিকার নাই। অর্থাৎ মাহারিবাদ বা মাতৃতান্ত্রিকতা সমাজে চার প্রকারে ক্রিয়াশীল যথা-১) মেয়েরা পরিবারের কর্ত্রী তথা পরিবার প্রধান, ২) মেয়েরা সম্পত্তির মালিক এবং উত্তরাধিকারী, ৩) মেয়েরা বিয়ের পরে স্বামীর বাড়িতে না গিয়ে স্বামীকে নিজের বাড়িতে আনে, ৪) পুত্র কন্যারা মায়ের গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং মাতৃকুল পদবী গ্রহণ করে।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত রীতি নীতি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরাই সকল সম্পত্তির মালিক। মায়ের সম্পত্তি কন্যারা সকলে সমান অংশ পাবে না। একমাত্র কন্যা হলে সেই সকল সম্পত্তির মালিক হবে। একাধিক কন্যা থাকলে পিতামাতা পরামর্শ করে যে কোন কন্যা সম্পত্তির প্রধান উত্তরাধিকারী হবে। তবে অধিকাংশ স্থলে কনিষ্ঠ কন্যাই উত্তরাধিকারী হয়। পিতামাতার মধ্যে মতানৈক্য হলে মা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। উত্তরাধিকারী বা নকমা/নাকমাকে অবশ্যই পিতৃবংশী থেকে মনোনীত একজন পিসতুতো ভাই/ফুফাত ভাইকে বিয়ে করতে হবে। নকমার স্বামীকে নক্রম বলা হয়। নক্রম স্ত্রীর পরিবারের অন্য পুরুষদের চেয়ে অধিক গুরুত্ব পায়। উল্লেখ্য, নকমা যদি পিতৃগোষ্ঠী থেকে বিবাহ করতে আপত্তি জানায় তবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না। অন্য মেয়েরা যদি পিতার গোত্র বহির্ভূত ব্যক্তিকে বিয়ে করে তবে তারা মায়ের সম্পত্তি পাবে না। নকমা বা প্রধান উত্তরাধিকারিনীর যদি কন্যা সন্তান না থাকে বা মারা যায় তাহলে তার যে কোনো বোনের কন্যা সম্পত্তি পাবে। কোনো কারণে নকমা মারা যায় এবং জামাই অন্য কোনো বোনকে বিয়ে করে (শ্যালিকা) তাহলে ওই বোনই সেই সম্পত্তির অধিকারিনী হবে। কোনো পরিবারে তিনটি কন্যা থাকে এবং নকমার কন্যা সন্তান আছে কিন্তু অন্য কোনো বোনের কন্যা সন্তান নাই বা কোনো সন্ত ানই নাই তাহলে নকমার কন্যাই অন্য বোনদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

যদি কোনো সন্তান না থাকে তবে ছেলে কিম্বা মেয়ে দত্তক গ্রহণ করতে পারে। তবে এ ব্যাপারে সমাজ ও পরিবারের অনুমতি নিতে হয়। দত্তক গৃহীত পিতা মাতার সঙ্গে বাস করতে হয়। আসল পিতামাতার নিকট কখনই যেতে পারবে না। পালিত কন্যা বা ছেলে যদি কিছুদিন থাকার পর চলে যায় তাহলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না।

কোনো স্ত্রী যদি স্বামীকে পরিত্যাগ করে অন্য কারোর সাথে চলে যায়, তাহলে সম্পত্তির উপর তার কোনো অধিকার থাকে না। স্ত্রীর যদি কন্যা সন্তান থাকে এবং স্ত্রীর সাথে চলে যায় তাহলে তারও কোনো অধিকার থাকে না। কন্যা সন্তান মায়ের সাথে না যায় পিতার সাথে থাকে তাহলে সেই প্রধান উত্তরাধিকারী হবে। যতদিন না সে সাবালিকা হয় ততদিন সম্পত্তিসহ পিতার কাছে থাকবে। এ রকম ক্ষেত্রে গৃহস্বামী বা স্বামীর কোনো দোষ না থাকে তবে সংসারত্যাগী স্ত্রীর গোত্র তাকে নতুন স্ত্রী এনে দিতে পারে। এই নববিবাহিতা স্ত্রী ভাবী নকমা অভিভাবকত্ব করবে। এমন অলিখিত আরো অনেক রীতিনীতি আছে। বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী উত্তরাধিকার আইন পুরোপুরিভাবে মানা হচ্ছে না। অনেক পরিবারের পিতামাতাই স্থাবর সম্পত্তির অংশ বিশেষ পুত্রদের দিয়ে দিচ্ছেন।

তঞ্চঙ্গ্যা:

পার্বত্য চট্টগ্রামে তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে সাতটি দল রয়েছে। দলগুলো মোগছা, কার্বোয়া গছা, ধন্যাগছা, মংলাগছা, লংলাগছা। তঞ্চঙ্গ্যারা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক। পিতার সূত্র ধরে তাদের গোষ্ঠী বা বংশ পরিচয় নির্ণয় করা হয়। পরিবারে পিতার পরে মাতা ও জৈষ্ঠ্য পুত্রের স্থান।

লুসেই, পাংখুয়া ও বম:

পার্বত্য চট্টগ্রামে এদের বসবাস। পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক। পিতাই হলো পরিবার প্রধান। পিতার পরিচয়ে বংশ গণনা করা হয়।

খাসি:

বৃহত্তর সিলেটে বসবাস। খাসিরা মাতৃতান্ত্রিক। মাতার সূত্র ধরে তাদের দল ও গোত্র পরিচয় নির্ণয় করা হয়। সর্ব কনিষ্ঠা কন্যাই পরিবারের অধিকাংশ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হয়ে পরিবারের দায়িত্ব পালন করে।

মারমা:

পিতা পরিবার প্রধান হলেও পারিবারিক কাজকর্মে মাতা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সামাজিক জীবনে মহিলাদের গুরুত্বের কারণে খালাতো ভাই বোনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, পিতামাতার পরে ছেলেমেয়েদের স্থান।

ত্রিপুরা :

ত্রিপুরারা পিতৃপ্রধান পরিবারের লোক। পিতা প্রধান, তারপর মাতা ও জৈষ্ঠ্য পুত্রের স্থান। একমাত্র ত্রিপুরা সমাজেই বেশ কয়েকটি গোত্রে দ্বিধারায় বংশ গণনা করার রীতি প্রচলিত আছে। একজন পুত্র তার পিতার দফা ও গোষ্ঠীর অধিকারী হলেও অনুরূপ একজন কন্যা তার মায়ের দফা ও গোষ্ঠীর অধিকারী হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে মহেন্দ্র লাল ত্রিপুরা লিখেছেন যে গোত্রে ছেলেরা পিতার বংশ এবং মেয়েরা মাতার বংশ অনুসরণ করে। অর্থাৎ ছেলেরা পিতার সম্পত্তি এবং মেয়েরা পায় মায়ের সম্পত্তি ।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় আদিবাসী নারী

আদিবাসী নারীদের বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন সংস্কৃতি ও সমাজে তাদের অবস্থা ও অবস্থান নিয়ে তথ্যবহুল আলোচনা করার মূলত দুটি উদ্দেশ্য, প্রথমত আদিবাসী নারী ও কন্যা শিশুদের জন্য কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা করার সময় যেন তাদের ভিন্নতা, বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করা হয়। দ্বিতীয়ত এই সমাজ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। কারণ আদিবাসী সমাজে সাধারণভাবে নারীরা অনেক বেশি স্বাধীন। সাধারণভাবে কোনো আদিবাসী পুরুষ কোনো আদিবাসী নারীকে নির্যাতন করে না। বাংলাদেশের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, বর্তমানে এইসব গোষ্ঠীর নারী যে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে সেটা ঘটছে অন্য সমাজের (বাঙালি জনগোষ্ঠী) পুরুষদের দ্বারা। যেমন দেখা গেছে, যেসব গোষ্ঠীতে মেয়েরা সম্পত্তির মালিক হয় তাদেরকে বাঙালি সমাজের পুরুষরা ভুলিয়ে অথবা জোরপূর্বক বিয়ে করে সম্পত্তির লোভে। পরে নির্যাতন করে তাড়িয়ে দেয় অথবা হত্যা করে। তবে আদিবাসীদের নিজস্ব সমাজে বাঙালিদের মতো নারী নির্যাতন প্রচলিত নয়। নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে খুঁজতে হবে আদিবাসী সমাজের নারীর এই অবস্থানের মূলমন্ত্র। যে মন্ত্রের কারণে ঐ সমাজের পুরুষ নারীদের সাথে সকল কাজে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু অত্যাচার নির্যাতন করে না। যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা করার সময় খুবই সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেন তথাকথিত উন্নয়নের নামে আদিবাসী সমাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য হারিয়ে না যায়। উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে যেন আমাদের সমাজের ভয়ঙ্কর অমানবিক অভ্যাসগুলো আদিবাসী সমাজে আরোপিত না হয়। এবার ফিরে আসি এই প্রবন্ধের শুরুর কথায় ”নারী ও কন্যাশিশুর উন্নয়নে বিনিয়ে